অগ্নিকান্ড বছরে ক্ষতি ১১০ কোটি টাকা

লিখেছেন **নজরুল ইসলাম সোহেল**

এক কোটি লোক অধ্যুষিত ঢাকা মহানগরীতে বড় ধরনের একটি অগ্নিকান্ড ঘটার সব উপাদানই সর্বত্র বিরাজ করছে। ঘটে যেতে পারে বলা কেন, এতো হরহামেশাই ঘটছে। শুধু ২০০৩ সালেই ঢাকাসহ সারা দেশে ৬,২৮৯টি অগ্নিকান্ডে ১১০ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

বৈদ্যুতিক গোলযোগ, চুলার আগুন আর সিগারেটের টুকরো এ তিনটিকেই ধরা হয় অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ হিসেবে। অথচ বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাণিজ্যিক ভবন, মার্কেট, গার্মেন্টসে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকা, ঢাকার রাস্তাগুলোর অপ্রশস্ততা, ফায়ার সার্ভিসের নানা সংকট সীমাবদ্ধতা; আর প্রচলিত আইনের প্রতি উপেক্ষা- এ সবই অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে বহু গুণ। সরেজমিন অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এমন তথ্য। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে তিন-চারতলা পর্যন্ত উঠে যাওয়া গুলিস্তান হকার্স মার্কেটে আগুন ধরে পুড়ে ছাই হলো কোটি কোটি টাকার সম্পদ অথচ এই মার্কেটের ১০০ গজের মাধ্যেই ঢাকা সিটি করপোরেশন, পুলিশ আর ফায়ার সার্ভিস হেড কোয়ার্টার।

প্রধান কারণ অপরিকল্পিত ঢাকা

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার 'বিউটিফিকেশন' করা হলেও নগরবাসীর মৌলিক সমস্যাগুলো রয়েই গেছে। ঠিক তেমনিভাবে রাজউক, ঢাকা সিটি করপোরেশন থাকার পরও ঢাকা বাড়ছে অপরিকল্পিতভাবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল একেই চিহ্নিত করছেন ঢাকায় ঘন ঘন অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ হিসেবে।

ঢাকায় প্রচুর বহুতল- বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না নিয়েই। এ ভবনগুলোর নকশা অনুমোদনের জন্য ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালকের ছাড়পত্র নেয়ার বিধান থাকায় সবাই নকশায় অগ্নি প্রতিরোধে নানা ব্যবস্থা রাখেন, যা পরে বাস্তবায়িত হয় না। অথচ এই নকশা লঙ্ঘনের দায়ে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের ভবনটি 'অগ্নিনির্বাপণের ক্ষেত্রে অনুপযোগিতার কারণে ব্যবহার উপযোগী নয়' এমন ঘোষণা দেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারে না। একইভাবে ঢাকার অনেক বড় বড় বিলাসবহুল মার্কেটের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও যে বঙ্গবাজার, গুলিস্তানের হকার্স মার্কেটের চেয়ে ভালো নয়, তা অনেকেই মানেন।

পুরান ঢাকার রাস্তাগুলোর অপ্রশস্ত, এটা বেশ পুরনো কথা। নতুন ঢাকার বড় রাস্তা, ভিআইপি রোডগুলো চমৎকার প্রশস্ত হলেও প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতোই বাড্ডা, মালিবাগ, মগবাজার, গোড়ান, কাঁঠালবাগানের অলিগলিগুলো এতো সরু যে, আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িই ঢুকতে পারবে না।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখেছেন, পরিদর্শন ব্যাংকের গুদামঘরের মতো স্পর্শকাতর স্থানেও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র- দলিলের সঙ্গে রাখা হয় বিস্ফোরকের পর্যায়ে পড়ে এমন অনেক কেমিক্যালস। সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকার কথা নয়। অথচ, বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়া গুদামঘর পাওয়াটাই নাকি অস্বাভাবিক ব্যাপার!

সমস্যা জর্জরিত ফায়ার সার্ভিস

নগর ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নানা ধরনের সমস্যা। রয়েছে ফায়ার স্টেশনের স্বল্পতা, বাজেট স্বল্পতা, অগ্নিনির্বাপণী সরঞ্জামের সংকট, লোকবলের অভাব। ঢাকা শহরে অগ্নি-নিরাপত্তাহীনতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে এসব সমস্যা।

কিছুদিন আগে বারিধারায় একটি ফায়ার স্টেশন উদ্বোধনের পর বলা হচ্ছিল ঢাকায় ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা একটি বেড়েছে। সামগ্রিক হিসেবে যা অসত্য। স্বাধীনতার পরও ঢাকায় ফায়ার স্টেশন ছিল ১২টি। এর মধ্যে গেন্ডারিয়া ভাড়া বাড়িতে থাকা ফায়ার

স্টেশনটি বহুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বারিধারার ফায়ার স্টেশনটি সেই সংখ্যাবাচক ঘাটতিই পূরণ করেছে মাত্র। ফায়ার স্টেশন এখনও ১২টি অর্থাৎ ৩৪ বছরেও ঢাকা শহরের আয়তন জনসংখ্যা, স্থাপনা, কারখানা বহুগুণে বাড়লেও ফায়ার স্টেশন বাড়েনি একটিও!

১ম ও ২য় শ্রেণী/নদী এবং স্ট্যান্ডবাই ফায়ার স্টেশন চার ভাগে বিভক্ত মোট ১৪৪টি ফায়ার স্টেশন ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে আছে সর্বোচ্চ ৪৪টি ফায়ার স্টেশন আর সর্বনিম্ন সিলেট বিভাগে ৬টি ফায়ার স্টেশন।

এবার সাজসরঞ্জামের কথায় আসা যাক। ২০০২-০৩ অর্থবছরের বিভাগীয় কার্যাবলীর প্রতিবেদনে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সাজসরঞ্জামের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাধিকারের (বিদ্যামান পোস্ট) বিপরীতে ঘাটতির পরিমাণ সবচেয়ে কম পানিবাহী গাড়িতে (১৪% ও ১১%)। বিশেষ অগ্নিনির্বাপণী সরঞ্জামের ক্ষেত্রে (যেমন পোর্টেবল পাম্প, টার্নটেবল লেজার ফোম টেন্ডার ইত্যাদি) এই ঘাটতির পরিমাণ ১৮% থেকে ৯২% পর্যন্ত।

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের এ যুগে যেভাবে বিশেষ ধরনের অগ্নিকান্ড হচ্ছে (যেমন রাসায়নিক আগুন, মিশ্র রাসায়নিক আগুন) তাতে সাজসরঞ্জামের এ অবস্থাকে অপ্রতুল বললেও কম বলা হবে। উন্নত বিশ্বে প্রতিজন ফায়ার ফাইটারের জন্য ২ সেট ফায়ার প্রটেক্টিং

ড্রেস থাকে। অথচ আমাদের দেশে প্রতি স্টেশনেই আছে মাত্র ৫-৬ সেট করে। অগ্নিকান্ড, বিশেষ করে রাসায়নিক ও মিশ্র রাসায়নিক অগ্নিকান্ড প্রতিকারের জন্যে জরুরি ভিত্তিতে ৩টি কেমিক্যাল টেন্ডার কেনা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

উপেক্ষিত আইন

অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে নানা সময়ে সরকার প্রণীত আইন, সুপারিশমালা আছে অনেক। কিন্তু মানা হচ্ছে না কিছুই। নানাভাবে আইনকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ আইনগুলো লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দেখার জন্য দেশে যেন কেউ নেই।

১৯৬৫ সালে প্রণীত কারখানা আইনের চতুর্থ অধ্যায় পুরোটাই নিরাপত্তাবিষয়ক। এ অধ্যায়ের ২২(৩) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'কোনো কারখানার কোনো ঘরের মধ্যে কোনো লোক উপস্থিত থাকা পর্যন্ত উক্ত ঘর থেকে বের হওয়ার দরজা তালাবদ্ধ বা অন্যভাবে শক্ত করে আটকিয়ে রাখা যাবে না। অথচ সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসে অগ্নিকান্ডের সময় কর্মরত শ্রমিকরা নিচে নেমে গেট তালাবদ্ধ দেখতে পায়। যে ঘটনায় ২২ জন মারা যায়। তবুও এখন পর্যন্ত অনেক গার্মেন্টসের গেটই তালা মারা থাকে।

১৯৯৭ সালে গার্মেন্টসসমূহে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় একটি সুপারিশমালা প্রণীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতি গার্মেন্টসের ৬% কর্মচারী সমন্বয়ে অগ্নিনির্বাপক দল গঠন, এদের পরিচিতির জন্যে ভিন্ন রঙের পোশাক প্রদান, পরিদর্শকের উপস্থিতিতে মাসে ন্যূনতম একবার মহড়া অনুষ্ঠান, ফায়ার এলার্ম স্থাপন, কারখানা অভ্যন্তরে ধূমপান- রান্নাবান্না বন্ধ করা, ফায়ার সার্ভিসের ন্যূনতম একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অগ্নিনির্বাপক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান ও প্রতি কারখানায় আসা-যাওয়ার জন্যে ন্যূনতম দুটি ও অগ্নিনির্বাপনের জন্যে একটি সিঁড়ি স্থাপন।

ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের পর দেখা গেছে, সিংহভাগ গার্মেন্টসে এই আইনগুলোর কোনোটিই মানা হয় না। গার্মেন্টসগুলোতে কেবল নামকাওয়াস্তে ছ'মাসে বা বছরে একবার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মোট তিনটি সিঁড়ি স্থাপনের কথা থাকলেও এমন ৪-৫ তলা গার্মেন্টসও আছে যেখানে ১টি সিঁড়িই বিদ্যমান। অভিযোগ আছে, গার্মেন্টসগুলোতে কয়েকটি ফায়ার এস্টিংগুইশার স্থাপন করা হয় কেবল আইওয়াশের জন্য। তাও আবার মেয়াদোত্তীর্ণটি নিয়মিতভাবে না বদলিয়ে বদলানো হয় মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা স্টিকারটি। এতো কিছুর পরও এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

উত্তরটা খুবই সহজ। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের কাঁধে সেই বিজিএমইএ, কারখানা পরিদর্শক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শকদের 'ম্যানেজ' করা হচ্ছে। এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে বিস্তর। ফায়ার সার্ভিসের একাধিক কর্মকর্তা স্বীকার করলেন, অনেক ক্ষেত্রেই পরিদর্শকরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন না। ভালোমতো ইন্সপেকশন হয় না।

সাজসরঞ্জামের পরিমাণ

নাম	প্রাধিকার (বিদ্যমান পোস্ট) (টি)	বিদ্যমান (টি)	ঘাটতি (টি)
১. পানিবাহী গাড়ি	১৫৬	১৩৯	১৭
২. পানিবাহী গাড়ি	১৯৩	১৭৪	১৯
৩. পাম্পবাহী গাড়ি	৩৩৯	২৭৮	৬১
৪. পোর্টেবল পাম্প	১২	১	১১
৫. টার্নটেবল লেডার	৭	১	৬
৬. স্নোরকেল	৭	৪	৩
৭. ফোম টেন্ডার	৭	৪	৩
৮. লাইটিং ইউনিট	৭	১	৬
৯. রেকার ভ্যান	৭	২	৫
১০. বিশেষ পানিবাহী গাড়ি	৭	৫	২
১১. ইমার্জেন্সি টেন্ডার	৮	২	৬

অগ্নি দুর্ঘটনার সংখ্যা, ক্ষয়ক্ষতি ও উদ্ধার

সাল	অগ্নি দুর্ঘটনার সংখ্যা (টি)	ক্ষয়ক্ষতি (প্রায়) (কোটি টাকা)	উদ্ধার (প্রায়) (কোটি টাকা)
২০০১	৫৯৭১	১২৪.১৭	২৬৭.৫৫
২০০২	৫৪০৪	১২১.২২	২৭৯.১০
২০০৩	৬২৮৯	১১০.৫৯	৩৭৪.৩৭

সূত্র : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

অগ্নি-প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩-এর ৭নং ধারায় আছে, (ফায়ার সার্ভিসের) মহাপরিচালকের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন বা অনুমোদিত নকশার সংশোধন করা যাবে না। এছাড়াও প্রতি কারখানার জন্যেও লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যার কোনো শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে 'অন্যূন ৬ মাসের কারাদন্ড ও ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।'

সরেজমিনে ঢাকা

১৮ জানুয়ারি, বিকেল ৩.৫০

গার্মেন্টসগুলোর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখতে প্রতিবেদক গিয়েছিলেন সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি গার্মেন্টসে। গেট খোলাই পাওয়া গেল। পরিচয় দিতেই একজন সরাসরি দোতলায় অফিসে নিয়ে গেলেন।

সুয়িং, কাটিং, ফিনিশিং প্রতিটির জন্যে দুটি করে বিরাট বড় ফ্লোর। নিচতলা থেকে দোতলার সিঁড়ির প্রশস্ততা চলনসই হলেও উপরের সিঁড়িগুলোতে দু'জন পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব নয়। প্রতি ফ্লোরেই পাঁচ-ছ'টি করে অ্যাস্টিংগুইশার দেখা গেল। আর আছে ফায়ার এলার্ম এবং হোসপাইপ। সুয়িং সেকশনে সেলাই মেশিনগুলো এমন ঠাসাঠাসি করে রাখা যে তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গেলে একে অন্যের গায়ে পড়বে নিশ্চিত। তার ওপর আছে মাত্র ২টি সিঁড়ি। গার্মেন্টসটিতে ৯০০ কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করে।

২. ১৯ জানুয়ারি ২০০৫, সকাল ১০টা। স্থান : বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট

দোকানগুলো মাত্র খুলেছে। কোনোটি এখনও বন্ধ। পাশাপাশি চারটি মার্কেট মিলে পুরো বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট। মার্কেট ভিন্ন হলেও দোকানগুলোর কাঠামো, ধরন একই। প্রায় তিন ফুট বাই ছয় ফুট মাপের একেকটি দোকান, দু'সারি দোকানের মাঝের অপ্রশস্ত স্থান দিয়ে দু'জনের বেশি পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব নয়। অল্প কিছু বাদে সবগুলো দোকানই কাঁচা। কাঠের ডিভাইডার উপরের ছাদ লোহা ও কাঠের সমন্বয়ে তৈরি, যেগুলোকে বলা হয় 'হাইলি ফায়ার ফেভার‍্যাবল ম্যাটারিয়ালস'। 'ইটের পর ইট' নয়, 'কাঠের পর কাঠ দিয়ে দোতলা-তিনতলা পর্যন্ত করা হয়েছে।

৩. ১৯ জানুয়ারি, ২০০৫, সকাল ১১.১৫

গত বছরের ২১ নবেম্বর আগুন লেগেছিল গুলিস্তানের নিউ বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেটে, যার আঁচ লাগে পাশের পাঁচতলা ভবনটিতেও। ভবনটির নিচে দাঁড়িয়ে আছি। লোকজনের আসা-যাওয়া নেই। ভেতরে ঢুকে ডানে মোড় নিতেই চোখে আঁধার দেখলাম। রোদ থেকে এসে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে কিছু সময় লাগলো। সিঁড়ির ঠিক আগে কেঁচিগেটে তালা মারা। বাঁয়ের এক দরজা দিয়ে আলো আসছে। উঁকি দিতেই দেখা গেলো দরজা-জানালাহীন একটা গুদামঘরে কিছু লোক আড্ডা মারছে। পেশাগত পরিচয় দিয়ে উপরে যেতে চাইলাম। 'আমাদের কাছে চাবি নেই' সাফ জবাব।

ঢাকা শহরকে অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপদ বলার কোনো অবকাশ নেই। এটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা জেলার সহকারী পরিচালকের সরল স্বীকারোক্তি। এই স্বীকারোক্তির মতো এটাও সত্য যে, একমাত্র মানুষের সচেতনতাই পারে অধিকাংশ অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ করতে। নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য আমাদের জীবনের নিরাপত্তাকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। তাই বলে কি সরকারের তরফ থেকে কিছুই করার নেই? ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক সেলিম নেওয়াজ ভুঁইয়া জানালেন, 'বর্তমান সরকারের আমলে ফায়ার সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন করা হচ্ছে। তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আরিচা-নগরবাড়ী, মনোহরদী, শ্রীনগর, সোনারগাঁও, শ্রীপুর, শিবালয়, উত্তরা এ স্থানগুলোতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হচ্ছে।

আশার কথা হলো, মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। একটা অ্যাস্টিংগুইশারের দাম কত? মাত্র ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। এর জন্যে নিশ্চয়ই জীবন আর সম্পদের প্রতি ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না?

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

'ফোন পাওয়ার পর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি রওনা দেয়। এটা আমার চ্যালেঞ্জ'

সেলিম নেওয়াজ ভুঁইয়া *সহকারী পরিচালক, ঢাকা জেলা*

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার দৃষ্টিতে ঢাকা শহরের সামগ্রিক অগ্নি-নিরাপত্তার অবস্থা কেমন? আপনি কি ঢাকাকে অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপদ মনে করেন?

সেলিম নেওয়াজ ভুঁইয়া : নিরাপদ বলার কোনো অবকাশ নেই। এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা, যা এ দেশের মানুষের মাঝে নেই। যেসব শিক্ষিত ভদ্রলোক ৩০ লাখ টাকার গাড়ি হাঁকায়, তারা গাড়ি এবং জীবন দুটোই বাঁচানোর জন্যে ২ হাজার টাকার ফায়ার অ্যাস্টিংগুইশার গাড়িতে রাখে না। সবাই নিজস্ব অবস্থান থেকে সচেতন না হলে, নিজেকে সিকিউরড না রাখলে ফায়ার সেফটির কথা চিন্তাও করা যায় না।

২০০০ : পুরান ঢাকা, বাড্ডা, মালিবাগ, মগবাজার, গোড়ান, কাঁঠালবাগান এমন অনেক এলাকাতেই রাস্তা এতো অপ্রশস্ত যে, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে পারবে না। এসব ক্ষেত্রে বা আরো বড় করে বললে নগর পরিকল্পনার ফায়ার সার্ভিস কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না?

সেলিম নেওয়াজ : এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। কেননা, যারা নগর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন তারা আমাদের সাহায্য না চাইলে আমরা তো কিছু করতে পারি না।

২০০০ : গত ৩৩ বছরে ১টি মাত্র ফায়ার স্টেশন বেড়েছে ঢাকা মহানগরীতে। আপনি কি মনে করেন না ফায়ার স্টেশনের স্বল্পতা আছে?

সেলিম নেওয়াজ : মোট হিসেবে ঢাকায় ফায়ার স্টেশন বাড়েনি। গেন্ডারিয়ার ফায়ার স্টেশনটি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি বারিধারায় চালু হয়েছে নতুন ফায়ার স্টেশন। অর্থাৎ আগের ১২টি আছে, যা কোনো হিসেবেই যথেষ্ট নয়। ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অন্তত আরো ১০টি নতুন ফায়ার স্টেশন হলে আপাত দুরূহ পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব।

২০০০ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, আপনারা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে পারেন না।

সেলিম নেওয়াজ : যারা এমন অভিযোগ করেন, তাদের আমি একটা কথাই বলবো, আপনারা একদিন ফায়ার স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে স্টেশনে ফোন করেন। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি বের হবে- এটা আমার চ্যালেঞ্জ। এরপর রাস্তা অপ্রশস্ত হতে পারে, জ্যাম থাকতে পারে সেখানেই দেরি হয়। আরেকটি ব্যাপার দেখতে হবে, ফায়ার সার্ভিসকে কতক্ষণ পর খবর দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে কেউই খবর দেয় না। অনেকেই মনে করে আমরা বোধহয় নিজে নিজেই খবর পেয়ে গেছি।